আস্‌ সাজদাহ

৩২

নামকরণ

১৫ আয়াতে সাজদাহর যে বিষয়বস্তু এসেছে তাকেই এ সূরার শিরোনাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিল হবার সময়-কাল

বর্ণনাভংগী থেকে বুঝা যায়, এর নাযিল হবার সময়টা হচ্ছে মক্কার মধ্যযুগ এবং তারও একেবারে শুরুর দিকে। কারণ পরবর্তী যুগে নাযিলকৃত সূরাগুলোর পশ্চাতভূমিতে যেমন জুলুম–নিপীড়নের প্রচণ্ডতা দেখা যায় এ সূরাটির পটভূমিতে সে ধরনের প্রচণ্ডতা অনুপস্থিত।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

সূরার বিষয়বস্তু হচ্ছে, তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাত সম্পর্কে লোকদের সন্দেহ দূর করা এবং এ তিনটি সত্যের প্রতি ঈমান আনার জন্য তাদেরকে আহবান জানানো। মক্কার কাফেরদের মধ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে আলোচনা চলছিল যে, এ ব্যক্তি অদ্ভুত সব কথা বানিয়ে বানিয়ে শুনাচ্ছে। কখনো মরার পরের খবরও দেয় এবং বলে মরে পঁচে মাটিতে মিশে যাবার পর তোমাদের আবার উঠানো হবে। সবার হিসেব–নিকেশ হবে এবং দোজখ হবে ও বেহেশ্‌ত হবে। কখনো বলে, এসব দেব–দেবী, ঠাকুর–টাকুর এসব কিছুই নয়। একমাত্র এক ও একক আল্লাহই উপাস্য। কখনো বলে, আমি আল্লাহর রসূল। আকাশ থেকে আমার কাছে অহী আসে। যে বাণী আমি তোমাদের শুনাচ্ছি এসব আমার বাণী নয় বরং আল্লাহর বাণী। এ ব্যক্তি আমাদের এ অদ্ভুত কাহিনী শুনাচ্ছে। এসব কথার জবাব দেয়াই হচ্ছে এ সূরার মূল আলোচ্য বিষয়।

এর জবাবে কাফেরদেরকে বলা হয়েছে, নিসন্দেহে এগুলো আল্লাহর কালাম ও বাণী। নবুওয়াতের কল্যাণ বঞ্চিত গাফলতির নিদ্রায় বিভোর একটি জাতিকে জাগিয়ে দেবার জন্য এ কালাম নাযিল করা হয়েছে। আল্লাহর পক্ষ থেকে এর অবতীর্ণ হবার বিষয়টি যখনি সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন তখন তোমরা একে মিথ্যা বলতে পারো কেমন করে?

তারপর তাদেরকে বলা হয়েছে, এ কুরআন তোমাদের সামনে যেসব সত্য পেশ করে, বুদ্ধি–বিবেক ব্যবহার করে নিজেরাই চিন্তা করে বলো এর মধ্যে কোন্‌টা তোমাদের মতে অদ্ভুত? আকাশ ও পৃথিবীর ব্যবস্থাপনা দেখো, নিজেদের জন্ম ও গঠনাকৃতি সম্পর্কে চিন্তা

করো—এ সবকিছু কি এ কুরআনে এ নবীর মাধ্যমে তোমাদের যেসব শিক্ষা দেয়া হচ্ছে তার সত্যতার প্রমাণ নয়? বিশ্ব-জাহানের এ ব্যবস্থা তাওহীদের সত্যতা প্রমাণ করে, না শিরকের? এ সমগ্র ব্যবস্থা দেখে এবং তোমাদের নিজেদের জন্মের ব্যাপারটি দৃষ্টি সমক্ষে রেখে তোমাদের বুদ্ধি-বিবেক কি একথাই বলে যে, যিনি বর্তমানে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন তিনি পুনর্বার তোমাদের সৃষ্টি করতে পারবেন না?

এরপর পরলোকের একটা চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। ঈমানের পুরস্কার ও কুফরের পরিণাম বর্ণনা করে লোকদেরকে অশুভ পরিণামের মুখোমুখি হবার আগে ত্যাগ ও কুরআনের শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। তাদেরকে নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে যে, এভাবে তাদের নিজেদের পরিণাম শুভ ও সুন্দর হবে।

তারপর তাদেরকে বলা হয়েছে, আল্লাহ মানুষের ভুলের দরুন তাকে আকস্মিকভাবে চূড়ান্ত ও শেষ শাস্তি দেবার জন্য পাকড়াও করেন না, এটা তাঁর মহা অনুগ্রহ। বরং এর পূর্বে তাকে ছোটখাটো কষ্ট, বিপদ-আপদ ও ক্ষতির সম্মুখীন করেন। তাকে হাল্‌কা হাল্‌কা ও কম কষ্টকর আঘাত করতে থাকেন। এভাবে তাকে সতর্ক করতে থাকেন, যাতে তার চোখ খুলে যায়। মানুষ যদি এসব প্রাথমিক আঘাতে সতর্ক হয়ে যায় তাহলে তা হবে তার নিজের জন্য ভালো।

এরপর বলেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে এক ব্যক্তির কাছে কিতাব এসেছে, দুনিয়ায় এটা কোন প্রথম ও নতুন ঘটনা নয়। এর আগে মূসার (আলাইহিস সালামের) কাছেও তো কিতাব এসেছিল। একথা তোমরা সবাই জানো। এটা এমন কী কথা যে, তা শুনেই তোমরা এভাবে কানখাড়া করছো। বিশ্বাস করো এ কিতাব আল্লাহরই পক্ষ থেকে এসেছে এবং মূসার (আ) যুগে যা কিছু হয়েছিল এখন আবার সেসব কিছুই হবে, একথা নিশ্চিত জেনো। আল্লাহর এ কিতাবকে যারা মেনে নেবে এখন নেতৃত্ব তারাই লাভ করবে। একে যারা প্রত্যাখ্যান করবে তাদের জন্য নিশ্চিত ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছুই নেই।

তারপর মক্কার কাফেরদেরকে বলা হয়েছে, নিজেদের বাণিজ্যিক সফরকালে তোমরা অতীতের যেসব জাতির ধ্বংসে প্রাপ্ত জনপদ অতিক্রম করে থাকো তাদের পরিণাম দেখো। নিজেদের জন্য তোমরা কি এ পরিণাম পছন্দ করো? বাইরের অবস্থা দেখে প্রতারিত হয়ো না। আজ তোমরা দেখছো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা কতিপয় ছেলে-ছোকরা, গোলাম ও গরীব মানুষ ছাড়া আর কেউ শুনছে না এবং চারদিক তাঁর বিরুদ্ধে কেবল বিদ্রূপ, তিরস্কার ও নিন্দাবাদ ধ্বনিত হচ্ছে। এ থেকে তোমরা ধারণা করে নিয়েছো, এ বক্তব্য-বিষয় টেকসই হবে না, কিছু দিন চলবে তারপর খতম হয়ে যাবে। কিন্তু এটা কেবল তোমাদের দৃষ্টিভ্রম। তোমরা দিনরাত দেখছো আজ একটি জমি নিষ্ফল পড়ে আছে, সেখানে পানি ও লতাপাতার চিহ্নমাত্রও নেই। জমিটি দেখে কেউ কল্পনাও করতে পারে না যে, এর গর্ভে সবুজ ও শ্যামলিমার বিশাল ভাণ্ডার লুকিয়ে আছে। হঠাৎ পরদিন বৃষ্টিপাত হতেই ঐ মরা মাটির বুকে দেখা দেয় অভাবিত পূর্ব জীবন প্রবাহ এবং সর্বত্র সবুজের বিচিত্র সমারোহ।

উপসংহারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, এরা তোমার কথা শুনে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছে এবং জিজ্ঞেস করছে, জনাব! আপনার সেই চূড়ান্ত

বিজয় কবে অর্জিত হবে? তার সন–তারিখটা একটু বলেন না। ওদেরকে বলো, যখন আমাদের ও তোমাদের ফায়সালার সময় আসবে তখন তা মেনে নেয়ায় তোমাদের কোন উপকার হবে না। মানতে হয় এখন মানো। আর যদি শেষ ফায়সালার অপেক্ষা করতে চাও তাহলে বসে বসে তা করতে থাকো।

الٓمٓ ﴿١﴾ تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢﴾ اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ۚ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ اَتٰىهُمْ مِّنْ نَّذِيْرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ ﴿٣﴾

আলিফ লাম মীম। এ কিতাবটি রব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ, এতে কোন সন্দেহ নেই।[১]

এরা[২] *কি বলে, এ ব্যক্তি নিজেই এটি তৈরি করে নিয়েছেন?*[৩] *না, বরং এটি সত্য তোমার রবের পক্ষ থেকে,*[৪] *যাতে তুমি সতর্ক করতে পারো এমন একটি জাতিকে যাদের কাছে তোমার পূর্বে কোন সতর্ককারী আসেনি, হয়তো তারা সৎপথে চলবে।*[৫]

১. কুরআন মজীদের অনেকগুলো সূরা এ ধরনের কোন না কোন পরিচিতিমূলক বক্তব্য দিয়ে শুরু হয়েছে। এ বাণী কোথায় থেকে আসছে সূরার শুরুতেই তা জানিয়ে দেয়াই হয় এর উদ্দেশ্য। রেডিও ঘোষক প্রোগ্রাম শুরু করার সূচনাতেই যেমন ঘোষণা করে দেন, আমি অমুক স্টেশন থেকে বলছি, এটা বাহ্যত তেমনি ধরনের একটা ভূমিকাসূচক বক্তব্য। কিন্তু রেডিওর এমনি ধরনের একটা মামুলি ঘোষণার বিপরীতে কুরআন মজীদের কোন সূরার সূচনা যখন এ ধরনের একটা অসাধারণ ঘোষণার মাধ্যমে শুরু হয়, যাতে বলা হয়, এ বাণী আসছে বিশ্ব–জাহানের শাসনকর্তার পক্ষ থেকে তখন এটা শুধুমাত্র বাণীর উৎস বর্ণনা করাই হয় না বরং এই সংগে এর মধ্যে শামিল হয়ে যায় একটা বিরাট বড় দাবী, একটা বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ এবং একটা কঠোর ভীতি প্রদর্শনও। কারণ কথা শুরু করেই সে ঝট্ করে এত বড় একটা খবর দিয়ে দিচ্ছে যে, এটা মানুষের কথা নয় বরং বিশ্ব–জাহানের মালিক ও প্রভুর কথা। সংগে সংগেই এ ঘোষণা মানুষের সামনে এ দাবী স্বীকার করা না করার প্রশ্ন উত্থাপন করে। স্বীকার করলে চিরকালের জন্য তার সামনে আনুগত্যের শির নত করে দিতে হবে, তারপর তার মোকাবিলায় মানুষের আর কোন স্বাধীনতা থাকতে পারে না। আর স্বীকার না করলে নিশ্চিতভাবেই তাকে একটা ভয়াবহ আশংকার মুখোমুখি হতে হবে। অর্থাৎ যদি সত্যিই

এটা বিশ্ব-জাহানের প্রভুর বাণী হয়ে থাকে তাহলে একে প্রত্যাখ্যান করার ফল স্বরূপ তাকে চিরন্তন দুর্ভাগ্যের শিকার হতে হবে। এ জন্য এ ভূমিকাসূচক বাক্যটির শুধুমাত্র নিজের এই প্রকৃতিগত অসাধারণত্বেরই কারণে মানুষকে কান লাগিয়ে চূড়ান্ত মনোনিবেশ সহকারে এ বাণী শোনার এবং একে আল্লাহর বাণী হিসেবে স্বীকার করার বা না করার ফায়সালা করতে বাধ্য করে।

এ কিতাব রব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে নাযিল করা হয়েছে, শুধুমাত্র এতটুকু কথা বলেই এখানে শেষ করা হয়নি। বরং এর পরেও পূর্ণ জোরেশোরে বলা হয়েছে لَا رَيْبَ فِيْهِ অর্থাৎ এটা আল্লাহর কিতাব এবং আল্লাহর কাছ থেকে এর অবতীর্ণ হবার ব্যাপারে আদৌ কোন সন্দেহের অবকাশই নেই। এ তাকিদসূচক বাক্যাংশটিকে যদি কুরআন নাযিলের ঘটনামূলক পটভূমি এবং খোদ কুরআনের নিজের পূর্বাপর বক্তব্যের আলোকে দেখা হয় তাহলে পরিষ্কার অনুভব করা যাবে যে, তার মধ্যে দাবীর সাথে যুক্তি-প্রমাণও নিহিত রয়েছে এবং এ যুক্তি-প্রমাণ মক্কা মু'আয্‌যমার যেসব অধিবাসীর সামনে এ দাবী পেশ করা হচ্ছিল তাদের কাছে গোপন ছিল না। এ কিতাব উপস্থাপন কারীর সমগ্র জীবন তাদের সামনে ছিল। কিতাব উপস্থাপন করার আগেরও এবং পরেরও। তারা জানতো, যিনি এ দাবী সহকারে এ কিতাব পেশ করছেন তিনি আমাদের জাতির সবচেয়ে সত্যবাদী, দায়িত্বশীল ও সৎ চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি। তারা এও জানতো যে, নবুওয়াত দাবী করার একদিন আগে পর্যন্তও কেউ তাঁর মুখ থেকে কখনো সেসব কথা শোনেনি যেগুলো নবুওয়াত দাবী করার পরপরই তিনি সহসাই বলতে শুরু করে দিয়েছিলেন। তারা এ কিতাবের ভাষা ও বর্ণনাভংগী এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভাষা ও বর্ণনাভংগীর মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য দেখতে পেতো। তারা পরিষ্কারভাবে একথাও জানতো যে, একই ব্যক্তি কখনো এত বেশী সুস্পষ্ট পার্থক্য সহকারে দু'টি ভিন্ন স্টাইলের অধিকারী হতে পারে না। তারা এ কিতাবের একান্ত অসাধারণ সাহিত্য অলংকারও দেখছিল এবং আরবী ভাষাভাষী হিসেবে তারা নিজেরাই জানতো যে, তাদের সকল কবি ও সাহিত্যিক এর নজির পেশ করতে অক্ষম হয়েছে। তাদের জাতির কবি, গণক ও বাগ্মীদের বাণী এবং এ বাণীর মধ্যে কত বড় ফারাক রয়েছে এবং এ বাণীর মধ্যে যে পবিত্র-পরিচ্ছন্ন বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে তা কত উন্নতমানের তাও তাদের অজানা ছিল না। তারা এ কিতাব এবং এর উপস্থাপকের দাওয়াতের মধ্যে কোথাও দূরবর্তী এমন কোন স্বার্থপরতার সামান্যতম চিহ্নও দেখতে পেতো না যা থেকে কোন মিথ্যা দাবীদারের কথা ও কাজ কখনো মুক্ত হতে পারে না। নবুওয়াতের দাবী করে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের, নিজের পরিবার অথবা নিজের গোত্র ও জাতির জন্য কি অর্জন করতে চাচ্ছিলেন এবং এ কাজের মধ্যে তাঁর নিজের কোন্ স্বার্থটি নিহিত রয়েছে তা তারা অণুবীক্ষণ যন্ত্র লাগিয়েও চিহ্নিত করতে পারতো না। তারপর এ দাওয়াতের দিকে তাঁর জাতির কেমন ধরনের লোকেরা আকৃষ্ট হয়ে চলছে এবং তার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে তাদের জীবনে কতবড় বিপ্লব সাধিত হচ্ছে তাও তারা দেখছিল। এ সমস্ত বিষয় মিলে মিশে দাবীর স্বপক্ষে যুক্তি হিসেবে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। তাই এ পটভূমিতে একথা বলা একদম যথেষ্ট ছিল যে, এ কিতাবের রব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে নাযিলকৃত হওয়াটা সকল প্রকার সন্দেহ-সংশয়ের উর্ধে। এর পাশে আরো কোন যুক্তি বসিয়ে যুক্তির বহর বৃদ্ধি করার কোন প্রয়োজন ছিল না।

২. ওপরের ভূমিকামূলক বাক্যের পর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাত সম্পর্কে মক্কার মুশরিকরা যে প্রথম আপত্তিটি করতো সেটির পর্যালোচনা করা হচ্ছে।

৩. এটি নিছক প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসা নয়। বরং এখানে মহাবিস্ময় প্রকাশের ভংগী অবলম্বন করা হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে, যে সমস্ত বিষয়ের কারণে এ কিতাবের আল্লাহর কাছ থেকে অবতীর্ণ হওয়ার ব্যাপারটি যাবতীয় সন্দেহ-সংশয়মুক্ত হয় সেসব সত্ত্বেও কি এরা প্রকাশ্যে এমন হঠকারিতার কথা বলে যাচ্ছে যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজেই এটি রচনা করে মিথ্যামিথ্যি একে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের রচনা বলে চালিয়ে দিয়েছেন? এমন একটি বাজে ও ভিত্তিহীন দোষারোপ করতে তারা একটুও লজ্জিত হচ্ছে না? যারা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং তাঁর কথা ও কাজ সম্পর্কে জানে আর এ কিতাবটিও অনুধাবন করে তারা এ বাজে ও ভিত্তিহীন দোষারোপের কথা শুনে কি অভিমত পোষণ করবে সে সম্পর্কে কোন অনুভূতি কি তাদের নেই?

৪. যেভাবে প্রথম আয়াতে لَا رَيْبَ فِيْهِ বলা যথেষ্ট মনে করা হয়েছিল এবং কুরআনুল করীমের আল্লাহর কালাম হবার স্বপক্ষে এর চেয়ে বড় কোন যুক্তি পেশ করার প্রয়োজন মনে করা হয়নি। অনুরূপভাবে মক্কার কাফেরদের মিথ্যা অপবাদের জবাবে কেবলমাত্র এতটুকু বলাই যথেষ্ট মনে করা হচ্ছে যে, "এটি সত্য তোমার রবের পক্ষ থেকে।" ওপরে এক নম্বর টীকায় আমরা যে কারণ বর্ণনা করেছি এর কারণও তাই। কে, কোন্ ধরনের পরিবেশে, কিভাবে এ কিতাব পেশ করছিলেন সেসব বিষয় শ্রোতাদের সামনে ছিল এবং এ কিতাবও তার নিজস্ব ভাষাশৈলী, সাহিত্য সম্পদ ও বিষয়বস্তু সহকারে সবার সামনে ছিল। এই সংগে এর প্রভাব ও ফলাফলও মক্কার সমকালীন সমাজে সবাই স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করছিল। এ অবস্থায় এ কিতাবের রব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে আগত সত্য হওয়াটা এমন সুস্পষ্ট বাস্তব ঘটনা ছিল যাকে শুধুমাত্র চূড়ান্তভাবে বর্ণনা করে দেয়াই কাফেরদের দোষারোপ খণ্ডনের জন্য যথেষ্ট ছিল। এ জন্য কোন যুক্তি প্রদান করার প্রচেষ্টা চালানো প্রতিপাদ্য বিষয়কে মজবুত করার পরিবর্তে তাকে আরো দুর্বল করে দেবার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ব্যাপারটি ঠিক যেমন নাকি দিনের বেলা সূর্য কিরণ দিতে থাকে এবং কোন বেহায়া বেলাজ ব্যক্তি নির্দ্বিধায় বলে দেয় এখন তো অন্ধকার রাত। এর জবাবে কেবলমাত্র এতটুকু বলাই যথেষ্ট হয় যে, তুমি একে রাত বলছো? এখন তো সামনে রয়েছে আলো ঝলমল দিন। এরপর দিনের উপস্থিতির স্বপক্ষে যদি যুক্তি প্রমাণ পেশ করা হয়, তাহলে এর ফলে নিজের জবাবের শক্তিবৃদ্ধি করা হবে না বরং তার শক্তি কিছুটা কমই করে দেয়া হবে।

৫. অর্থাৎ যেমন এর সত্য হওয়া ও আল্লাহর পক্ষ থেকে হওয়াটা নিশ্চিত ও সন্দেহাতীত বিষয় ঠিক তেমনি এর পেছনে সদুদ্দেশ্য থাকা এবং তোমাদের জন্য এর আল্লাহর রহমত হওয়াটাও সুস্পষ্ট। তোমরা নিজেরাই জানো শত শত বছর থেকে তোমাদের মধ্যে কোন নবী আসেনি। তোমরা নিজেরাই জানো তোমাদের সমগ্র জাতিটাই মূর্খতা, অজ্ঞতা, নৈতিক অধপতন ও মারাত্মক ধরনের পশ্চাদপদতায় ভুগছে। এ মূর্খতার মধ্যে যদি তোমাদেরকে জাগ্রত করার ও সঠিক পথ দেখাবার জন্য তোমাদের মধ্যে একজন নবী পাঠানো হয়ে থাকে, তাহলে এতে তোমরা অবাক হচ্ছো কেন? এটা তো

একটি মস্ত বড় প্রয়োজন এবং তোমাদের কল্যাণার্থে আল্লাহ এ প্রয়োজন পূর্ণ করে দিয়েছেন।

উল্লেখ্য, আরবে সত্য দীনের আলো সর্বপ্রথম পৌঁছেছিল হযরত হূদ ও হযরত সালেহ আলাইহিমাস সালামের মাধ্যমে। এটা ছিল প্রাগৈতিহাসিক যুগের ঘটনা। তারপর আসেন হযরত ইবরাহীম ও হযরত ইসমাঈল আলাইহিমাস সালাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামের যুগের আড়াই হাজার বছর আগে অতিক্রান্ত হয়েছিল তাঁদের যুগ। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পূর্বে আরবের যমীনে যে সর্বশেষ নবী পাঠানো হয় তিনি ছিলেন হযরত শো'আইব আলাইহিস সালাম। তার আগমনের পরও প্রায় দু'হাজার বছর অতিক্রান্ত হয়েছিল। এ সময়টা এত দীর্ঘ ছিল যে, এ প্রেক্ষিতে এ জাতির মধ্যে কোন সতর্ককারী আসেনি একথা বলা একেবারেই যথার্থ ছিল। এ উক্তির অর্থ এ নয় যে, এ জাতির মধ্যে কখনো কোন সতর্ককারী আসেনি। বরং এর অর্থ হচ্ছে, সুদীর্ঘকাল থেকে এ জাতি একজন সতর্ককারীর প্রত্যাশী ছিল।

এখানে আর একটা প্রশ্ন সামনে এসে যায়। সেটাও পরিষ্কার করে দেয়া দরকার। এ আয়াতটি পড়তে গিয়ে মানুষের মনে সংশয় জাগে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পূর্বে শত শত বছর পর্যন্ত আরবে যখন কোন নবী আসেননি তখন সে জাহেলী যুগে যেসব লোক অতিক্রান্ত হয়ে গেছে তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে কিসের ভিত্তিতে? সৎপথ কোন্‌টা এবং অসৎপথ তথা পথভ্রষ্টতা কোন্‌টা তা কি তারা জানতো? তারপর যদি তারা পথভ্রষ্ট হয়ে থাকে তাহলে তাদের এ পথভ্রষ্টতার জন্য তাদেরকে দায়ী করা যেতে পারে কেমন করে? এর জবাব হচ্ছে, সেকালের লোকদের দীনের বিস্তারিত জ্ঞান না থাকলেও আসল দীন যে তাওহীদ তথা আল্লাহর একত্ববাদ এবং নবীগণ কখনো মূর্তিপূজা শিখাননি, একথা সেকালেও লোকদের অজানা ছিল না। আরবের লোকেরা তাদের দেশে আবির্ভূত নবীদের যেসব বাণী ও ঐতিহ্যের অধিকারী হয়েছিল তার মধ্যেও এ সত্য সংরক্ষিত ছিল। নিকটতম দেশগুলোয় আগত নবীগণ যথা হযরত মূসা, হযরত দাউদ, হযরত সুলাইমান ও হযরত ঈসা আলাইহিমুস সালামের শিক্ষার মাধ্যমেও তারা এ সত্যের সন্ধান পেয়েছিল। আরবী প্রবাদসমূহের মাধ্যমে একথা ব্যাপকভাবে প্রচারিত ও সর্বজন পরিচিত ছিল যে, প্রাচীন যুগে আরববাসীদের আসল ধর্ম ছিল ইবরাহীমের ধর্ম এবং মূর্তিপূজা সে দেশে শুরু করেছিল আমর ইবনে লুহাই নামক এক ব্যক্তি। শিরক ও মূর্তিপূজার ব্যাপক প্রচলন সত্ত্বেও আরবের বিভিন্ন অংশে স্থানে স্থানে এমন সব লোক ছিল যারা শিরক অস্বীকার করতো, তাওহীদের ঘোষণা দিতো এবং মূর্তির বেদীমূলে বলিদান করার প্রকাশ্যে নিন্দা করতো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আমলের একেবারেই কাছাকাছি সময়ে কুস্‌সা ইবনে সায়েদাতিল ইয়াদী, উমাইয়াহ ইবনে আবিস সাল্‌ত, সুওয়াইদ ইবনে আমরিল মুস্‌তালেকী, ওকী ইবনে সালামাহ ইবনে যুহাইরিল ইয়াদী, আমর ইবনে জুন্‌দুবিল জুহানী, আবু কায়েস সার্‌মাহ ইবনে আবী আনাস, যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইল, ওয়ারাকাহ ইবনে নওফাল, উসমান ইবনুল হুওয়াইরিস, উবাইদুল্লাহ ইবনে জাহাশ, আমের ইবনুয্ যরবিল আদওয়ানী, আল্লাফ ইবনে শিহাবিত তামিমী, আলমুতালামমিস ইবনে উমাইয়াহ আলকিনানী, যুহাইর ইবনে আবী সুলমা, খালেদ ইবনে সিনান ইবনে গাইসিল আব্‌সী, আবদুল্লাহ আলকুদ্বাঈ এবং এ ধরনের আরো বহু লোকের

اَللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَیْنَهُمَا فِیْ سِتَّةِ اَیَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰی عَلَی الْعَرْشِ ؕ مَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّلِیٍّ وَّلَا شَفِیْعٍ ؕ اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ ④

আল্লাহই[৬] আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এদের মাঝখানে যা কিছু আছে সব সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে এবং এরপর আরশে সমাসীন হয়েছেন।[৭] তিনি ছাড়া তোমাদের কোন সাহায্যকারী নেই এবং নেই তাঁর সামনে সুপারিশকারী, তারপরও কি তোমরা সচেতন হবে না?[৮]

অবস্থা আমরা ইতিহাস থেকে জানতে পারি। ইতিহাসে এঁদেরকে 'হুনাফা' তথা সঠিক সত্যপন্থী নামে স্মরণ করা হয়। এঁরা সবাই প্রকাশ্যে তাওহীদকে আসল দীন বলে ঘোষণা করতেন এবং মুশরিকদের ধর্মের সাথে নিজেদের সম্পর্কহীনতার কথা পরিষ্কারভাবে প্রকাশ করতেন। একথা সুস্পষ্ট, পূর্ববর্তী নবীগণের যেসব শিক্ষা সমাজে তখনো প্রচলিত ছিল তার প্রভাব থেকেই তাদের মনে এ চিন্তার জন্ম হয়েছিল। তাছাড়া ইয়ামনে খৃস্টীয় চতুর্থ–পঞ্চম শতকের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের যে শিলালিপি আধুনিক প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার মাধ্যমে আবিষ্কৃত হয়েছে তা থেকে জানা যায়, সেকালে সেখানে একটি তাওহীদী ধর্মের অস্তিত্ব ছিল। তার অনুসারীদের আকাশ ও পৃথিবীর করুণাময় রবকেই একক ইলাহ ও উপাস্য স্বীকার করতো। ৩৭৮ খৃষ্টাব্দের একটি শিলালিপি পাওয়া গেছে একটি প্রাচীন উপাসনালয়ের ধ্বংসাবশেষ থেকে। তাতে লিখিত আছে, এ উপাসনালয়টি "যু–সামাওয়া"র "ইলাহ" অর্থাৎ আকাশের ইলাহি অথবা আকাশের রবের ইবাদাত করার জন্য নির্মাণ করা হয়েছে। ৪৬৫ খৃস্টাব্দের একটি শিলালিপিতে লিখিত হয়েছে :

بنصر وردا الهن بعل سمين وارضين (بنصرو بعون الا له رب السماء ولارض)

এ কথাগুলো সুস্পষ্টভাবে তাওহীদ বিশ্বাসের কথা ব্যক্ত করছে। একটি কবরগাত্রে সে যুগের আর একটি শিলালিপি পাওয়া গেছে। তাতে লেখা আছে :

بخيل رحمنن (يعنى استعين بحول الرحمن)

অনুরূপভাবে দক্ষিণ আরবে ফোরাত নদী ও কিন্নাসিরীনের মাঝখানে যাবাদ নামক স্থানে ৫১২ খৃস্টাব্দের একটি শিলালিপি পাওয়া গেছে। তাতে লিখিত আছে :

بسم الا له ، لا عز الا له ، لا شكر الا له

এ সমস্ত কথাই প্রকাশ করছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতলাভের পূর্বে পূর্ববর্তী নবীগণের শিক্ষার প্রভাব আরব ভূখণ্ড থেকে একেবারে

يُدَبِّرُ الْاَمْرَ مِنَ السَّمَاۤءِ اِلَى الْاَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ اِلَيْهِ فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗۤ اَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ ۝ ذٰلِكَ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۝

তিনি আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত দুনিয়ার যাবতীয় বিষয় পরিচালনা করেন এবং এ পরিচালনার বৃত্তান্ত ওপরে তাঁর কাছে যায় এমন একদিনে যার পরিমাপ তোমাদের গণনায় এক হাজার বছর।[৯] তিনিই প্রত্যেকটি অদৃশ্য ও দৃশ্যমানকে জানেন,[১০] মহাপরাক্রমশালী[১১] ও করুণাময়[১২] তিনি।

নির্মূল হয়ে যায়নি। কমপক্ষে "তোমাদের আল্লাহ এক ও একক" একথাটুকু স্মরণ করিয়ে দেবার মতো বহু উপায় ও উপকরণ বিদ্যমান ছিল। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল ফুরকান, ৮৪ টীকা)

৬. এবার মুশরিকদের দ্বিতীয় আপত্তির জবাব দেয়া হচ্ছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তাওহীদের দাওয়াতের ব্যাপারে তারা এ আপত্তিটি করতো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের দেবতা ও মনীষীদের উপাস্য হওয়ার কথা অস্বীকার করেন এবং জোরেশোরে এ দাওয়াত দেন যে, এক আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ, কর্ম সম্পাদনকারী, প্রয়োজন পূর্ণকারী, প্রার্থনা শ্রবণকারী, দুর্দশা নিরসনকারী ও স্বাধীন ক্ষমতা সম্পন্ন শাসক নেই, এ ব্যাপারে তারা কঠোর আপত্তি জানাতো।

৭. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আ'রাফ, ৫৪ আয়াত; ইউনুস, ৩ আয়াত এবং আর রা'য়াদ ২ আয়াত।

৮. অর্থাৎ পৃথিবী ও আকাশের স্রষ্টাইতো আসল খোদা। তোমাদের চিন্তা-ভাবনা কতই উদ্ভট, বিশ্ব-জাহানের এ বিশাল সাম্রাজ্যে তোমরা তাঁকে বাদ দিয়ে অন্যদেরকে কর্ম-সম্পাদনকারী মনে করে বসেছো। এ সমগ্র বিশ্ব-জাহান এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে মহান আল্লাহই এসবের স্রষ্টা। তাঁর সত্তা ছাড়া বাকি এখানে যা কিছু আছে সবই সৃষ্টি। মহান আল্লাহ এ দুনিয়া সৃষ্টি করার পর কোথাও গিয়ে ঘুমিয়েও পড়েননি। বরং তিনিই নিজের এ রাজ্যের সিংহাসনে আসীন এবং শাসনকর্তা হয়েছেন। অথচ তোমাদের বুদ্ধি এতই ভ্রষ্ট হয়ে গেছে যে, তোমরা সৃষ্টিকূলের মধ্য থেকে কয়েকটি সত্তাকে নিজেদের ভাগ্যের মালিক গণ্য করে বসেছো। যদি আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করতে না পারেন তাহলে তাদের মধ্য থেকে কার তোমাদের সাহায্য করার ক্ষমতা আছে? যদি আল্লাহ তোমাদেরকে পাকড়াও করেন, তাহলে তাদের মধ্য থেকে কে তোমাদেরকে তাঁর হাত থেকে ছাড়িয়ে নেবার শক্তি রাখে? যদি আল্লাহ সুপারিশ না শোনেন, তাহলে তাদের মধ্য থেকে কে তাঁর কাছ থেকে এ সুপারিশ গ্রহণ করিয়ে নেবার ক্ষমতা রাখে?

৯. অর্থাৎ তোমাদের কাছে যেটা এক হাজার বছরের ইতিহাস আল্লাহর কাছে যেন সেটা মাত্র একদিনের কাজ। আল্লাহর ইচ্ছা পূরণকারীদের হাতে আজ এর পরিকল্পনা পেশ করা হয় এবং কালই তারা এ বিবরণ তাঁর কাছে পেশ করে যাতে তাদেরকে আবার পরদিনের (অর্থাৎ তোমাদের হিসেবে এক হাজার বছর) কাজ দেয়া হয় এ প্রসংগটি কুরআনের আরো দু' জায়গায় এসেছে। সেগুলোও সামনে রাখলে এর অর্থ ভালোভাবে অনুধাবন করা যেতে পারে। আরবের কাফেররা বলতো ঃ মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নবুওয়াতের দাবী নিয়ে সামনে এসেছেন আজ কয়েক বছর হয়ে গেলো। তিনি বারবার আমাদের বলছেন, যদি আমার এ দাওয়াত তোমরা গ্রহণ না করো এবং আমাকে প্রত্যাখ্যান করো তাহলে তোমাদের ওপর আল্লাহর আযাব নেমে আসবে। কয়েক বছর থেকে তিনি নিজের এ দাবীর পুনরাবৃত্তি করে চলছেন কিন্তু আজো আযাব আসেনি। অথচ আমরা একবার নয় হাজার বার তাঁকে পরিষ্কারভাবে প্রত্যাখ্যান করেছি। তাঁর এ হুমকি যদি যথার্থই সত্য হতো তাহলে এতদিন কবে না জানি আমাদের ওপর আযাব এসে যেতো। এর জবাবে আল্লাহ সূরা হাজ্জে বলেন ঃ

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ ۚ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ

"এরা শীঘ্রই আযাব চাচ্ছে। আল্লাহ কখনো ওয়াদার বরখেলাফ করবেন না। কিন্তু তোমার রবের কাছে এক দিন তোমাদের গণনায় এক হাজার বছরের সমান হয়ে থাকে।" (৪৭ আয়াত)

অন্য এক জায়গায় একথার জবাব এভাবে দেয়া হয়েছে ঃ

سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ۝ لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ ۝ مِنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ ۝ تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ۝ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا ۝ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا ۝ وَنَرَاهُ قَرِيبًا ۚ

"প্রশ্নকারী প্রশ্ন করছে সেই আযাব সম্পর্কে, যা কাফেরদের ওপর আপতিত হবে, যার প্রতিরোধকারী কেউ নেই, সেই আল্লাহর পক্ষ থেকে যিনি সমুচ্চ স্তরসম্পন্ন (অর্থাৎ পর্যায়ক্রমে কাজ করেন)। ফেরেশ্‌তা ও রূহ তাঁর দিকে উঠতে থাকে এমন একদিনে যার পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর। কাজেই হে নবী! সুন্দর সবর অবলম্বন করুন। এরা তাকে দূরবর্তী মনে করে এবং আমি তাকে দেখছি নিকটে।

(আল মা'আরিজ, ১–৭ আয়াত)

এসব উক্তি থেকে যে কথা বুঝানো হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, মানুষের ইতিহাসে আল্লাহর ফায়সালা দুনিয়ার সময় ও পঞ্জিকা অনুসারে হয় না কোন জাতিকে যদি বলা হয়, অমুক নীতি অবলম্বন করলে তোমাদের এ ধরনের পরিণামের সম্মুখীন হতে হবে,

الَّذِيٓ اَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهٗ وَبَدَاَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِيْنٍ ⑦ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهٗ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيْنٍ ⑧ ثُمَّ سَوّٰىهُ وَنَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِهٖ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ۭ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ⑨

যে জিনিসই তিনি সৃষ্টি করেছেন উত্তমরূপেই সৃষ্টি করেছেন।[১৩] তিনি মানুষ সৃষ্টির সূচনা করেছেন কাদামাটি থেকে, তারপর তার বংশ উৎপাদন করেছেন এমন সূত্র থেকে যা তুচ্ছ পানির মতো।[১৪] তারপর তাকে সর্বাংগ সুন্দর করেছেন[১৫] এবং তার মধ্যে নিজের রূহ ফুঁকে দিয়েছেন,[১৬] আর তোমাদের কান, চোখ ও হৃদয় দিয়েছেন,[১৭] তোমরা খুব কমই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।[১৮]

তাহলে যে জাতি একথার এ অর্থ গ্রহণ করবে যে, আজই সে নীতি অবলম্বন করলে কালই তার অশুভ পরিণাম সামনে এসে যাবে, সে হবে বড়ই নির্বোধ। পরিণামফল প্রকাশের জন্য দিন, মাস, বছর তো কোন্ ছার শতাব্দীও তেমন কোন দীর্ঘ কাল নয়।

১০. অন্য যেই হোক না কেন তার কাছে একটি জিনিস প্রকাশিত থাকলে অন্য অসংখ্য জিনিস রয়েছে অপ্রকাশিত। ফেরেশতা, জিন, নবী, ওলী অথবা আল্লাহর নির্বাচিত পছন্দনীয় বান্দাগণ যেই হোন না কেন তাদের মধ্যে এমন একজনও নেই যিনি সবকিছু জানেন। একমাত্র আল্লাহ এ গুণের অধিকারী, তাঁর কাছে সবকিছুই দিনের আলোকের মতই উজ্জ্বল। যা কিছু হয়ে গেছে, যা কিছু বর্তমান, যা কিছু হবে সবই তার কাছে সমান আলোকোজ্জ্বল।

১১. অর্থাৎ প্রত্যেকটি জিনিসের ওপর প্রাধান্যের অধিকারী। বিশ্ব–জাহানে এমন কোন শক্তি নেই যা তাঁর ইচ্ছার পথে প্রতিরোধ সৃষ্টি করতে এবং তাঁর আদেশ বাস্তবায়নে বাধা দিতে পারে। প্রত্যেকটি জিনিস তাঁর অধীন এবং তাঁর মোকাবিলা করার ক্ষমতা কারো নেই।

১২. অর্থাৎ এ প্রাধান্য, পরাক্রম ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি সত্ত্বেও তিনি জালেম নন। বরং নিজের সৃষ্টির প্রতি দয়ার্দ্র ও করুণাময়।

১৩. এ মহাবিশ্বে তিনি অসংখ্য ও অগণিত জিনিস সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু এর মধ্যে কোন একটি জিনিসও অসুন্দর, সৌষ্ঠবহীন ও বেখাপ্পা নয়। প্রত্যেকটি জিনিসের নিজস্ব একটি আলাদা সৌন্দর্য আছে। প্রত্যেকটি জিনিস তার নিজের জায়গায় সুসামঞ্জস্য ও উপযোগী। যে কাজের জন্য যে জিনিসই তিনি তৈরি করেছেন সবচেয়ে উপযোগী আকৃতিতে সর্বাধিক কার্যকর গুণাবলী সহকারে তৈরি করেছেন। দেখার জন্য চোখ ও শোনার জন্য কানের যে আকৃতি তিনি দিয়েছেন এর চেয়ে ভালো ও উপযোগী কোন আকৃতির কল্পনাও এ জন্য করা যেতে পারে না। হাওয়া ও পানি যেসব উদ্দেশ্যে তৈরী করা হয়েছে তাদের জন্য হাওয়া ঠিক তেমনি যেমন হওয়া উচিত এবং পানি ঠিক তেমনি

গুণাবলী সম্পন্ন যেমন তার হওয়া উচিত। আল্লাহর তৈরি করা কোন জিনিসের নক্‌শার মধ্যে কোন রকমের খুঁত বা ত্রুটি চিহ্নিত করা সম্ভবই নয় এবং তার মধ্যে কোন প্রকার সংস্কার সাধনের প্রস্তাব দেয়াও অসম্ভব।

১৪. অর্থাৎ প্রথমে তিনি নিজের প্রত্যক্ষ সৃষ্টিকর্মের (Direct Creation) মাধ্যমে মানুষ সৃষ্টি করেন এবং তারপর সেই মানুষের মধ্যেই বংশ বিস্তারের এমন শক্তি সৃষ্টি করে দেন যার ফলে তার শুক্র থেকে তারই মতো মানুষের জন্ম হতে থাকে। এ ক্ষেত্রে ভূমির সারবস্তু একত্র করে একটি সৃষ্টি–নির্দেশের মাধ্যমে তার মধ্যে এমন জীবন, চেতনা ও বুদ্ধিবৃত্তি সৃষ্টি করে দেন যার সাহায্যে মানুষের মতো একটি আশ্চর্য সৃষ্টি অস্তিত্ব লাভ করে, এটি ছিল একটি কর্মকুশলতা। আবার দ্বিতীয় কর্মকুশলতা হচ্ছে, আগামীতে আরো মানুষ তৈরি করার জন্য এমন একটি অদ্ভুত যন্ত্র মানুষের নিজের কাঠামোতেই রেখে দেন যার গঠন প্রকৃতি ও কার্যধারা দেখে মানবীয় বিবেক–বুদ্ধি বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে যায়।

কুরআন মজীদের যেসব আয়াত থেকে প্রথম মানুষের প্রত্যক্ষ সৃষ্টির কথা সুস্পষ্ট হয় এটি তার অন্যতম। ডারউইনের যুগ থেকে বিজ্ঞানীগণ এ চিন্তাধারার ব্যাপারে নাসিকা কুঞ্চন করে আসছেন এবং একটি অবৈজ্ঞানিক মতবাদ গণ্য করে অত্যন্ত তাচ্ছিল্যভরে একে প্রায় ঠেলে ফেলে দিয়ে থাকেন। কিন্তু মানুষের ও জীবের সমস্ত প্রজাতির না হোক অন্তত পক্ষে সর্বপ্রথম জীবন কোষের সরাসরি সৃষ্টি থেকে তো তাঁরা নিজেদের চিন্তাকে কোনক্রমেই মুক্ত করতে পারবেন না। এ সৃষ্টিকে মেনে না নেয়া হলে এ ধরনের একদম বাজে কথা মেনে নিতে হবে যে, জীবনের সূচনা হয় নিছক একটি দুর্ঘটনাক্রমে। অথচ শুধুমাত্র এক কোষসম্পন্ন (Cell) জীবের মধ্যে জীবনের সবচেয়ে সহজ অবস্থাও এতটা জটিল ও সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক কারুকাজে পরিপূর্ণ, যাকে একটি দুর্ঘটনার ফল গণ্য করা একেবারেই অযৌক্তিক। এটা ক্রমবিবর্তন মতবাদের প্রবক্তারা সৃষ্টি মতবাদকে যতটা অবৈজ্ঞানিক গণ্য করেন তার চেয়ে লাখো গুণ বেশী অবৈজ্ঞানিক। আর মানুষ যদি একবার একথা মেনে নেয় যে, জীবনের প্রথম কোষটি সরাসরি সৃষ্টির মাধ্যমে অস্তিত্বলাভ করেছিল, তাহলে এরপর আর একথা মেনে নিতে দোষ কি যে, জীবের প্রত্যেক প্রজাতির প্রথমজন স্রষ্টার সৃষ্টিকর্মের মাধ্যমে অস্তিত্বলাভ করে এবং তারপর তার বংশধারা প্রজনন প্রক্রিয়ার (Procreation) বিভিন্ন ধারার মাধ্যমে চলে আসছে। একথা মেনে নেবার ফলে এমন অনেক জটিল সমস্যার সমাধান হয়ে যায় ডারউইনবাদের পতাকাবাহীদের সকল বৈজ্ঞানিক কাব্য চর্চা সত্ত্বেও তাদের ক্রমবিবর্তন মতবাদে যেগুলোর কোন সমাধান হয়নি। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আলে ইমরান, ৩৫; আন নিসা, ১; আল আন'আম, ৬৩; আল আ'রাফ, ১০ ও ১৪৫; আল হিজ্‌র, ১৭; আল হাজ্জ, ৫; এবং আল মু'মিনূন, ১২–১৩ টীকা)

১৫. অর্থাৎ একটি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অস্তিত্ব থেকে বাড়িয়ে তাকে পূর্ণ মানবিক আকৃতিতে পৌঁছান এবং সমস্ত অংগ–প্রত্যংগ ও পঞ্চেন্দ্রিয় সহকারে তাকে পুরোপুরি শারীরিক আকৃতি দান করেন।

১৬. রূহ বলতে নিছক যে জীবন প্রবাহের বদৌলতে একটি জীবের দেহ যন্ত্র সচল ও সক্রিয় হয় তাকে বুঝানো হয়নি। বরং এমন বিশেষ সার সত্তা ও সার উপাদান বুঝানো হয়েছে যা চিন্তা, চেতনা, বুদ্ধি, বিবেক, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও স্বাধীন ক্ষমতার অধিকারী হয়

এবং যার বদৌলতে মানুষ পৃথিবীর অন্য সমস্ত সৃষ্টি থেকে পৃথক একটি ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন, অহংবোধের অধিকারী এবং প্রতিনিধিত্ব ক্ষমতা সম্পন্ন সত্তায় পরিণত হয়। এ রূহকে মহান আল্লাহ নিজের রূহ্ এ অর্থে বলেছেন যে, তা তাঁরই মালিকানাধীন এবং তাঁর পবিত্র সত্তার সাথে তাকে সম্পর্কিত করণ ঠিক তেমনি ধরনের যেমন একটি জিনিস তার মালিকের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে তার জিনিস হিসেবে আখ্যায়িত হয়। অথবা এর অর্থ হচ্ছে, মানুষের মধ্যে জ্ঞান, চিন্তা, চেতনা, ইচ্ছা, সংকল্প, সিদ্ধান্ত, ইখতিয়ার এবং এ ধরনের আরো যেসব গুণাবলীর উদ্ভব হয়েছে এসবই মহান আল্লাহর গুণাবলীর প্রতিচ্ছায়া। বস্তুর কোন যৌগিক উপাদান এদের উৎস নয় বরং এদের উৎস হচ্ছে আল্লাহর সত্তা। আল্লাহর তত্ত্বজ্ঞান থেকে সে জ্ঞান লাভ করেছে। আল্লাহর প্রজ্ঞা থেকে সে লাভ করেছে জ্ঞানবত্তা ও বিচক্ষণতা। আল্লাহর ক্ষমতা থেকে সে লাভ করেছে স্বাধীন ক্ষমতা। এসব গুণাবলী মানুষের মধ্যে কোন অজ্ঞান, নির্বোধ ও অক্ষম উৎস থেকে আসেনি। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল হিজর, ১৭ ও ১৯ টীকা)

১৭. এটি একটি সূক্ষ্ম বর্ণনাভংগী। রূহ সঞ্চার করার আগে মানুষের সমস্ত আলোচনা প্রথম পুরুষে করা হয় ঃ "তাকে সৃষ্টি করেছেন," "তার বংশ উৎপাদন করেছেন," "তাকে সর্বাংগ সুন্দর করেছেন", "তার মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করেছেন" এর কারণ হচ্ছে তখন পর্যন্ত সে সম্বোধন লাভের যোগ্যতা অর্জন করেনি। তারপর প্রাণ সঞ্চার করার পর এখন তাকে বলা হচ্ছে, "তোমাকে কান দিয়েছেন", "চোখ দিয়েছেন," "হৃদয় দিয়েছেন" কারণ প্রাণের অধিকারী হয়ে যাবার পরই সে এখন এমন যোগ্যতা অর্জন করেছে যার ফলে তাকে সম্বোধন করা যেতে পারে।

কান ও চোখ অর্থ হচ্ছে এমন সব মাধ্যম যার সাহায্যে মানুষ জ্ঞান আহরণ করে। যদিও জ্ঞান আহরণের মাধ্যমের মধ্যে জিহ্বা, নাসিকা ও ত্বকও অন্তরভুক্ত তবুও যেহেতু শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলোর তুলনায় অনেক বেশী বড় ও বেশী গুরুত্বপূর্ণ তাই কুরআন বিভিন্ন স্থানে এ দু'টিকেই আল্লাহর উল্লেখযোগ্য দান আকারে পেশ করছে। এরপর "হৃদয়" মানে হচ্ছে এমন একটি "মন" (Mind) যা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সংগৃহীত ও তথ্যাদি বিন্যস্ত করে তা থেকে ফলাফল বের করে আনে এবং কর্মের বিভিন্ন সম্ভাব্য পথগুলোর মধ্য থেকে কোন একটি পথ নির্বাচন করে এবং সে পথে চলার সিদ্ধান্ত নেয়।

১৮. অর্থাৎ এ মহান মর্যাদাসম্পন্ন মানবিক রূহ এত উন্নত পর্যায়ের গুণাবলী সহকারে তোমাকে তো এ জন্য দেয়া হয়নি যে, তুমি দুনিয়ায় পশুদের মতো অবস্থান করবে এবং পশুরা নিজেদের জীবনের যে চিত্র তৈরি করতে পারে তুমি তোমার জীবনের জন্য তেমনি ধরনের একটি চিত্র তৈরি করে নেবে। এ চোখ দু'টি তোমাকে দেয়া হয়েছিল অন্তরদৃষ্টি দিয়ে দেখার জন্য, অন্ধ হয়ে থাকার জন্য দেয়া হয়নি। এ কান দু'টি তোমাকে দেয়া হয়েছিল পূর্ণ মনোযোগ সহকারে শোনার জন্য, বধির হয়ে বসে থাকার জন্য নয়। এ হৃদয় তোমাকে দেয়া হয়েছিল সত্যকে বুঝার এবং সঠিক চিন্তা ও কাজ করার জন্য। এ জন্য দেয়া হয়নি যে, তোমার সমস্ত যোগ্যতা কেবলমাত্র নিজের পাশবিক প্রবৃত্তি লালনের উপকরণ সংগ্রহে ব্যয় করবে এবং এর চাইতে যদি কিছুটা ওপরে ওঠো তাহলে নিজের স্রষ্টার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের দর্শন ও কর্মসূচী তৈরি করতে লেগে যাবে। আল্লাহর কাছ থেকে এ মহামূল্যবান নিয়ামত লাভ করার পর যখন তুমি নাস্তিক্যবাদ বা শিরকের পথ অবলম্বন

وَقَالُوٓا۟ ءَإِذَا ضَلَلْنَا فِى ٱلْأَرْضِ أَءِنَّا لَفِى خَلْقٍ جَدِيدٍۭ ۚ بَلْ هُم بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ كَـٰفِرُونَ ۞ قُلْ يَتَوَفَّىٰكُم مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِى وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ۞

আর[১৯] এরা বলে, "যখন আমরা মাটিতে মিশে একাকার হয়ে যাবো তখন কি আমাদের আবার নতুন করে সৃষ্টি করা হবে?" আসল কথা হচ্ছে, এরা নিজেদের রবের সাথে সাক্ষাৎকার অস্বীকার করে।[২০] এদেরকে বলে দাও, "মৃত্যুর যে ফেরেশ্‌তাকে তোমাদের ওপর নিযুক্ত করা হয়েছে সে তোমাদেরকে পুরোপুরি তার কব্‌জায় নিয়ে নেবে এবং তারপর তোমাদেরকে তোমাদের রবের কাছে ফিরিয়ে আনা হবে।[২১]

করো, যখন তুমি নিজেই খোদা বা অন্য খোদাদের বান্দা হয়ে বসো, যখন তুমি প্রবৃত্তির দাস হয়ে দেহ ও কামনার ভোগ-লালসায় ডুবে যেতে থাকো তখন যেন নিজের খোদাকে একথা বলো যে, আমি এসব নিয়ামতের যোগ্য ছিলাম না, আমাকে মানুষ হিসেবে সৃষ্টি না করে একটি বানর, নেকড়ে, কুমীর বা কাক হিসেবে সৃষ্টি করা উচিত ছিল।

১৯. রিসালাত ও তাওহীদ সম্পর্কে কাফেরদের আপত্তির জবাব দেবার পর এবার ইসলামের তৃতীয় মৌলিক আকীদা অর্থাৎ আখেরাত সম্পর্কে তাদের আপত্তি উল্লেখ করে তার জবাব দেয়া হচ্ছে। আয়াতে وَقَالُوٓا۟ শব্দের প্রথমে যে "ওয়াও" হরফটি বসানো হয়েছে সেটি আসলে পূর্ববর্তী বিষয়বস্তুর সাথে এ প্যারাগ্রাফটির সম্পর্ক জুড়ে দিয়েছে। অর্থাৎ শব্দ বিন্যাস যেন এভাবে করা হয়েছে ঃ "তারা বলে মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল নয়", "তারা বলে আল্লাহ একক উপাস্য নয়" এবং "তারা বলে আমরা মারা যাবার পর আবার আমাদের উত্থান হবে না।"

২০. ওপরের বাক্য এবং এ বাক্যের মধ্যে পুরোপুরি একটি কাহিনী অব্যক্ত রয়ে গেছে। শ্রোতার চিন্তার ওপর এটা ছেড়ে দেয়া হয়েছে। প্রথম বাক্যে কাফেরদের যে আপত্তির কথা বলা হয়েছে তা এতই বাজে ও উদ্ভট যে, তার প্রতিবাদ করার প্রয়োজন অনুভব করা হয়নি। শুধুমাত্র তার উল্লেখ করাই তার উদ্ভট হওয়ার বিষয়টি প্রকাশ করার জন্য যথেষ্ট মনে করা হয়েছে। কারণ তাদের আপত্তি যে দু'টি অংশ নিয়ে সে দু'টিই আদতে অযৌক্তিক। তাদের একথা বলা, "আমরা মাটিতে মিশে যাবো" এর কি অর্থ হতে পারে? "আমরা" যে জিনিসটির নাম সেটি আবার কবে মাটিতে মিশে যায়? মাটিতে তো কেবল সেই দেহ মিশে যায় যার ভেতর থেকে "আমরা" বের হয়ে গেছে। দেহের নাম "আমরা" নয়। জীবন্ত অবস্থায় যখন সেই দেহের অংশগুলো কেটে ফেলা হয় তখন অংগের পর অংগ কেটে ফেলা হয় কিন্তু "আমরা" পুরোপুরি নিজের জায়গায় থেকে যায়। তার কোন একটি অংশও কর্তিত কোন অংগের সাথে চলে যায় না। আর যখন "আমরা" দেহ থেকে বের

হয়ে যায় তখন সম্পূর্ণ দেহটি বর্তমান থাকলেও তার ওপর এই "আমরা" এর কোন সামান্যতম অংশও প্রযোজ্য হয় না। তাইতো একজন প্রাণ উৎসর্গকারী প্রেমিক নিজের প্রেমাস্পদের মৃতদেহটি নিয়ে কবরস্থ করে। কারণ প্রেমাস্পদ সে দেহ থেকে বের হয়ে গেছে। এখন আর সে প্রেমাস্পদ নয়। বরং যে দেহের মধ্যে এক সময় প্রেমাস্পদ থাকতো সেই শূন্য দেহ পিঞ্জরটিকে সে দাফন করে। কাজেই আপত্তি উথাপনকারীদের আপত্তির প্রথম কথাই ভিত্তিহীন। এখন থাকে এর দ্বিতীয় অংশ। অর্থাৎ "আমাদের কি আবার নতুন করে সৃষ্টি করা হবে?" এ ধরনের অস্বীকার ও বিস্ময়সূচক প্রশ্ন আদতে সৃষ্টিই হতো না যদি আপত্তিকারীরা কথা বলার আগে এই "আমরা" এবং এ প্রশ্নের উদ্ভব ঘটার তাৎপর্য নিয়ে একটু খানি চিন্তা-ভাবনা করতো। এই "আমরা" এর বর্তমান জন্মের উৎস এ ছাড়া আর কি যে, কোথাও থেকে কয়লা, কোথাও থেকে লোহা, কোথাও থেকে চুন এবং এ ধরনের অন্যান্য উপকরণ একত্র হয়ে গেছে আর এরপর তাদের মৃত্তিকার দেহ পিঞ্জরে এ "আমরা" বিরাজিত হয়েছে। তারপর তাদের মৃত্যুর পর কি ঘটে? তাদের মৃত্তিকার দেহপিঞ্জর থেকে যখন "আমরা" বের হয়ে যায় তখন তাদের আবাস নির্মাণ করার জন্য মাটির বিভিন্ন অংশ থেকে তাদের শরীরের যেসব অংশ সংগ্রহ করা হয়েছিল তা সবই সেই মাটিতে ফিরে যায়। প্রশ্ন হচ্ছে, প্রথমে যে এই "আমরা"কে এ আবাস তৈরি করে দিয়েছিলেন, তিনি কি পুনরবার সেই একই উপকরণের সাহায্যে সেই একই আবাস তৈরি করে নতুন করে তাদেরকে তার মধ্যে রাখতে পারেন না? এ জিনিস যখন প্রথমে সম্ভব ছিল এবং ঘটনার আকারে সংঘটিত হয়েও গেছে তখন দ্বিতীয়বার এর সম্ভব হবার এবং ঘটনার রূপ পরিগ্রহ করার পথে বাধা কোথায়? সামান্য বুদ্ধি ব্যবহার করলে মানুষ নিজেই এগুলো বুঝতে পারে। কিন্তু এ ব্যাপারে সে নিজের বুদ্ধি প্রয়োগ করে না কেন? কি কারণে সে জেনে বুঝে মৃত্যু পরের জীবন ও পরকাল সম্পর্কে এ ধরনের অযথা আপত্তি তুলছেন? মাঝখানের সমস্ত আলোচনা বাদ দিয়ে মহান আল্লাহ দ্বিতীয় বাক্যে এ প্রশ্নেরই জবাব দিচ্ছেন এভাবে ঃ "আসলে এরা এদের রবের সাথে সাক্ষাতকার অস্বীকার করে।" অর্থাৎ আসল কথা এ নয় যে, পুনরবার সৃষ্টি কোন অভিন্ন ও অসম্ভব কথা, ফলে একথা তারা বুঝতে পারছে না। বরং তাদের একথা বুঝার পথে যে জিনিসটি বাধা দিচ্ছে তা হচ্ছে তাদের এ ইচ্ছা যে, তারা পৃথিবীতে স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াবে, ইচ্ছা মতো পাপকাজ করবে এবং তারপর কোন প্রকার দণ্ড লাভ না করেই(Scl-Frcc) এখান থেকে বের হয়ে যাবে, তারপর তাদেরকে কোন জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না এবং নিজেদের কৃতকর্মের জন্য কোন জবাবদিহি তাদের করতে হবে না।

২১. অর্থাৎ তোমাদের সেই "আমরা" মাটিতে মিশে একাকার হয়ে যাবে না বরং তার কর্মসময় শেষ হতেই আল্লাহর মউতের ফেরেশ্‌তা আসবে এবং তাকে দেহ থেকে বের করে পুরোপুরি নিজের কব্‌জায় নিয়ে নেবে। তার কোন সামান্যতম অংশও দেহের সাথে থেকে গিয়ে মাটিতে মিশে যাবে না। তাকে সম্পূর্ণত এবং একেবারে অবিকৃত ও অটুট অবস্থায় তত্ত্বাবধানে (Custody) নিয়ে নেয়া হবে এবং তার রবের সামনে পেশ করা হবে।

এ সংক্ষিপ্ত আয়াতে অনেকগুলো সত্যের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। এগুলোকে হালকা দৃষ্টিতে দেখে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া ঠিক নয়।

وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَآ أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ﴿١٢﴾ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّى لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١٣﴾ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَآ إِنَّا نَسِينَٰكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾

২ রুকূ'

হায়,[২২] যদি তুমি দেখতে সে সময় যখন এ অপরাধীরা মাথা নিচু করে তাদের রবের সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে। (তখন তারা বলতে থাকবে) "হে আমাদের রব। আমরা ভালোভাবেই দেখে নিয়েছি ও শুনেছি, এখন আমাদের ফেরত পাঠিয়ে দাও, আমরা সৎকাজ করবো, এবার আমাদের বিশ্বাস হয়ে গেছে।" (জবাবে বলা হবে) "যদি আমি চাইতাম তাহলে পূর্বাহ্নেই প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার হিদায়াত দিয়ে দিতাম।[২৩] কিন্তু আমার সে কথা পূর্ণ হয়ে গেছে, যা আমি বলেছিলাম যে, আমি জাহান্নাম জিন ও মানুষ দিয়ে ভরে দেবো।[২৪] কাজেই আজকের দিনের এ সাক্ষাতকারের কথা ভুলে গিয়ে তোমরা যে কাজ করেছো এখন তার মজা ভোগ কর।[২৫] আমিও এখন তোমাদের ভুলে গিয়েছি, নিজেদের কর্মফল হিসেবে চিরন্তন আযাবের স্বাদ আস্বাদন করতে থাকো।"

এক : এখানে দ্ব্যর্থহীনভাবে বলে দেয়া হয়েছে যে, মৃত্যু এমনভাবে আসে না যেমন নাকি একটি ঘড়ি চলতে চলতে হঠাৎ দম শেষ হয়ে যাবার কারণে বন্ধ হয়ে যায়। বরং এ কাজের জন্য আসলে আল্লাহ একজন বিশিষ্ট ফেরেশ্তা নিযুক্ত করে রেখেছেন। তিনি এসে যথারীতি রূহকে ঠিক তেমনিভাবে গ্রহণ করেন যেমন একজন সরকারী আমীন (Official Receiver) কোন জিনিস নিজের কব্জায় নিয়ে নেয়। কুরআনের অন্যান্য স্থানে এর আরো যে বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে তা থেকে জানা যায়, মৃত্যু বিভাগীয় এ অফিসারের অধীনে পুরোপুরি একটি আমলা বাহিনী রয়েছে। তারা মৃত্যু দান করা, রূহকে দেহ থেকে বের করে আনা এবং তাকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেবার বহুতর দায়িত্ব পালন করেন। তাছাড়া এ আমলারা অপরাধী রূহ ও সৎ মু'মিন রূহদের সাথে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহার করেন। (এসব বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য সূরা নিসা, ৯৭; আন'আম, ৯৩; আন নাহ্ল, ২৮; এবং ওয়াকি'আহ ৮৩ ও ৯৪ আয়াত দেখুন)

দুই : এ থেকে একথাও জানা যায় যে, মৃত্যুর ফলে মানুষের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যায় না। বরং তার রূহ দেহ থেকে বের হয়ে সঞ্জীবিত থাকে। কুরআনের "মৃত্যুর ফেরেশ্‌তা তোমাদেরকে পুরোপুরি তার কব্‌জায় নিয়ে নেবে" শব্দগুলো এ সত্যটির প্রকাশ করে। কারণ কোন বিলুপ্ত জিনিসকে কব্‌জায় নেয়া বা নিয়ন্ত্রণাধীন করা হয় না। কব্‌জায় বা অধিকারে নিয়ে নেবার অর্থই হচ্ছে অধিকৃত জিনিস অধিকারকারীর কাছে রয়েছে।

তিন : এ থেকে এও জানা যায় যে, মৃত্যুকালে যে জিনিসটি অধিকারে নিয়ে নেয়া হয় তা মানুষের জৈবিক জীবন (Biological life) নয় বরং তার সেই অহম (Ego) যাকে "আমরা" ও "তুমি" "তোমরা" শব্দাবলীর সাহায্যে চিত্রিত করা হয়। এ অহম দুনিয়ার কাজ করে যে ধরনের ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয় তার সবটুকুই পুরোপুরি (Intact) বের করে নেয়া হয়। এমনভাবে বের করে নেয়া হয় যার ফলে তার গুণাবলীতে কোনপ্রকার কমবেশী দেখা দেয় না। মৃত্যুর পরে এ জিনিসই তার রবের কাছে ফিরিয়ে দেয়া হয়। একেই পরকালে নবজন্ম ও নতুন দেহ দান করা হবে। এরি বিরুদ্ধে 'মোকদ্দমা' চালানো হবে। এর কাছ থেকেই হিসেব নেয়া হবে এবং একেই পুরস্কার ও শাস্তি দেয়া হবে।

২২. এবার মানুষের এ "অহম" যখন তার রবের কাছে ফিরে গিয়ে নিজের হিসেব দেবার জন্য তাঁর সামনে দাঁড়াবে তখনকার অবস্থার চিত্র অংকন করা হচ্ছে।

২৩. অর্থাৎ এভাবে সত্যের সাথে সাক্ষাত ও বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে যদি লোকদেরকে পথ দেখানো আমার লক্ষ হতো তাহলে দুনিয়ার জীবনে এত বড় পরীক্ষার মধ্য দিয়ে তোমাদের এখানে আনার কি দরকার ছিল? এ ধরনের পথের দিশা তো আমি তোমাদেরকে আগেও দিতে পারতাম। কিন্তু শুরু থেকেই তো তোমাদের জন্য আমার এ পরিকল্পনা ছিল না। আমি তো প্রকৃত সত্যকে দৃষ্টির অন্তরালে এবং ইন্দ্রিয়ের স্পর্শ ও অনুভবের বাইরে রেখে তোমাদের পরীক্ষা নিতে চাচ্ছিলাম। আমি দেখতে চাচ্ছিলাম, তোমরা সরাসরি তাকে আবরণমুক্ত দেখার পরিবর্তে বিশ্ব-জাহানে এবং স্বয়ং তোমাদের নিজেদের মধ্যে তার আলামতগুলো দেখে নিজের বুদ্ধির সাহায্যে তাকে চিনতে পারো কিনা, আমি নিজের নবীদের ও কিতাবসমূহের সাহায্যে এ সত্যকে চিনে নেবার ব্যাপারে তোমাদের যে সাহায্য করতে চাচ্ছি তা থেকে তোমরা ফায়দা হাসিল করছো কি না এবং সত্যকে জেনে নেবার পর নিজের প্রবৃত্তিকে এতটা নিয়ন্ত্রিত করতে পারো কিনা যার ফলে কামনা ও বাসনার দাসত্ব মুক্ত হয়ে তোমরা এ সত্যকে মেনে নেবে এবং এ অনুযায়ী নিজের জীবন ধারার সংস্কার সাধন করবে। এ পরীক্ষায় তোমরা ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছো। এখন পুনর্বার এ পরীক্ষার সিলসিলা শুরু করায় লাভ কি? দ্বিতীয় পরীক্ষাটি যদি এমনভাবে নেয়া হয় যে, তোমরা এখানে যা কিছু শুনেছো ও দেখেছো তা যদি সব মনেই থেকে যায়, তাহলে আদতে সেটা কোন পরীক্ষাই হবে না। আর যদি আগের মতো সকল চিন্তা-ভাবনা মুক্ত করে এবং সত্যকে দৃষ্টির অগোচরে রেখে তোমাদের আবার দুনিয়ায় সৃষ্টি করা যায় এবং প্রথম বারে যেমন নেয়া হয়েছিল ঠিক তেমনিভাবে একেবারে নতুন করে তোমাদের পরীক্ষা নেয়া হয়, তাহলে বিগত পরীক্ষার তুলনায় ফলাফল কিছুই ভিন্নতর হবে না। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আল বাকারাহ, ২২৮; আল আন'আম, ৬ ও ১৪১; ইউনূস, ২৬ এবং আল মু'মিনূন, ৯১ টীকা)

إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ۩ ﴿١٥﴾ تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿١٦﴾

আমার আয়াতের প্রতি তো তারাই ঈমান আনে যাদেরকে এ আয়াত শুনিয়ে যখন উপদেশ দেয়া হয় তখন তারা সিজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং নিজেদের রবের প্রশংসা সহকারে তাঁর মহিমা ঘোষণা করে এবং অহংকার করে না।[২৬] তাদের পিঠ থাকে বিছানা থেকে আলাদা, নিজেদের রবকে ডাকে আশংকা ও আকাংখা সহকারে[২৭] এবং যা কিছু রিযিক আমি তাদেরকে দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে।[২৮]

২৪. মহান আল্লাহ আদম সৃষ্টির সময় ইবলিসকে সম্বোধন করে যে উক্তি করেছিলেন সেদিকে ইংগিত করা হয়েছে। সূরা সাদের শেষ রুকূ'তে সে সময়ের পুরো ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। ইবলিস আদমকে সিজদাহ করতে অস্বীকার করে এবং আদমের বংশধরদেরকে পথভ্রষ্ট করার জন্য কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের অবকাশ চায়। জবাবে আল্লাহ বলেন,

فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ ۝ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ

"কাজেই এ হচ্ছে সত্য এবং আমি সত্যই বলি যে, আমি জাহান্নাম ভরে দেবো তোমার এবং মানুষদের মধ্য থেকে যারা তোমার অনুসরণ করবে তাদের দ্বারা।"

أَجْمَعِينَ শব্দটি এখানে এ অর্থে ব্যবহার করা হয়নি যে, সকল জিন ও সমস্ত মানুষকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। বরং এর অর্থ হচ্ছে, শয়তানরা এবং শয়তানদের অনুসারী মানুষরা সবাই এক সাথে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

২৫. অর্থাৎ একদিন যে নিজের রবের সামনে যেতে হবে একথা দুনিয়ায় আয়েশ–আরামে মত্ত হয়ে একদম ভুলে গেছো।

২৬. অন্য কথায় তারা নিজেদের বিভ্রান্ত চিন্তা পরিহার করে আল্লাহর কথা মেনে নেয়া এবং আল্লাহর বন্দেগী অবলম্বন করে তাঁর ইবাদাত করাকে নিজেদের জন্য সম্মানহানিকর মনে করে না। আত্মম্ভরিতা তাদেরকে সত্যগ্রহণ ও রবের আনুগত্য করার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না।

২৭. অর্থাৎ আয়েশ–আরাম করে রাত কাটাবার পরিবর্তে তারা নিজেদের রবের ইবাদাত করে। তাদের অবস্থা এমনসব দুনিয়াপূজারীদের মতো নয় যাদের দিনের পরিশ্রমের কষ্ট দূর করার জন্য রাতে নাচ–গান, শরাব পান ও খেলা তামাশার মতো আমোদ প্রমোদের প্রয়োজন হয়। এর পরিবর্তে তাদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, সারা দিন নিজেদের

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِىَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾ أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا ۚ لَّا يَسْتَوُۥنَ ﴿١٨﴾ أَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ فَلَهُمْ جَنَّٰتُ ٱلْمَأْوَىٰ نُزُلًۢا بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾

তারপর কেউ জানে না তাদের কাজের পুরস্কার হিসেবে তাদের চোখের শীতলতার কি সরঞ্জাম লুকিয়ে রাখা হয়েছে।[২৯] এটা কি কখনো হতে পারে, যে ব্যক্তি মু'মিন সে ফাসেকের মতো হয়ে যাবে?[৩০] এ দু'পক্ষ সমান হতে পারে না।[৩১] যারা ঈমান এনেছে এবং যারা সৎকাজ করেছে তাদের জন্য তো রয়েছে জান্নাতের বাসস্থান[৩২] আপ্যায়নের জন্য তাদের কাজের প্রতিদানস্বরূপ।

দায়িত্ব পালন করে কাজ শেষে এসে দাঁড়ায় তারা নিজেদের রবের সামনে। তাঁকে স্মরণ করে রাত কাটিয়ে দেয়। তাঁর ভয়ে কাঁপতে থাকে এবং তাঁর কাছেই নিজেদের সমস্ত আশা-আকাংখা সমর্পণ করে।

বিছানা থেকে পিঠ আলাদা রাখার মানে এ নয় যে, তারা রাতে শয়ন করে না। বরং এর অর্থ হচ্ছে, তারা রাতের একটি অংশ কাটায় আল্লাহর ইবাদাতের মধ্য দিয়ে।

২৮. রিযিক বলতে বুঝায় হালাল রিযিক। হারাম ধন-সম্পদকে আল্লাহ তাঁর প্রদত্ত সম্পদ হিসেবে বর্ণনা করেন না। কাজেই এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে, যা সামান্য কিছু পবিত্র রিযিক আমি দিয়েছি তা থেকেই খরচ করে। তার সীমা অতিক্রম করে নিজের খরচপাতি পুরা করার জন্য হারাম সম্পদে হাত দেয় না।

২৯. বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী ও মুসনাদে আহমাদে বিভিন্ন সূত্রে হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণিত এই হাদীসে কুদসীটি উদ্ধৃত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

قال الله تعالى اعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر

"আল্লাহ বলেন, আমার সৎকর্মশীল বান্দাদের জন্য আমি এমনসব জিনিস সংগ্রহ করে রেখেছি যা কখনো কোন চোখ দেখেনি, কোন কান শোনেনি এবং কোন মানুষ কোনদিন তা কল্পনাও করতে পারে না।"

এ বিষয়বস্তুটিই সামান্য শাব্দিক হেরফের করে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা), হযরত মুগীরাহ ইবনে শু'বা (রা) এবং হযরত সাহ্‌ল ইবনে সা'আদ সায়েদী নবী করীম (সা)

وَاَمَّا الَّذِیۡنَ فَسَقُوۡا فَمَاۡوٰىهُمُ النَّارُ ؕ كُلَّمَاۤ اَرَادُوۡۤا اَنۡ يَّخۡرُجُوۡا مِنۡهَاۤ اُعِيۡدُوۡا فِيۡهَا وَقِيۡلَ لَهُمۡ ذُوۡقُوۡا عَذَابَ النَّارِ الَّذِىۡ كُنۡتُمۡ بِهٖ تُكَذِّبُوۡنَ ﴿۲۰﴾ وَلَنُذِيۡقَنَّهُمۡ مِّنَ الۡعَذَابِ الۡاَدۡنٰى دُوۡنَ الۡعَذَابِ الۡاَكۡبَرِ لَعَلَّهُمۡ يَرۡجِعُوۡنَ ﴿۲۱﴾ وَمَنۡ اَظۡلَمُ مِمَّنۡ ذُكِّرَ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ ثُمَّ اَعۡرَضَ عَنۡهَا ؕ اِنَّا مِنَ الۡمُجۡرِمِيۡنَ مُنۡتَقِمُوۡنَ ﴿۲۲﴾

আর যারা ফাসেকীর পথ অবলম্বন করেছে তাদের আবাস হচ্ছে জাহান্নাম। যখনই তারা তা থেকে বের হতে চাইবে তার মধ্যেই ঠেলে দেয়া হবে এবং তাদেরকে বলা হবে, আস্বাদন করো এখন সেই আগুনের শাস্তির স্বাদ যাকে তোমরা মিথ্যা বলতে।

সেই বড় শাস্তির পূর্বে আমি এ দুনিয়াতেই (কোন না কোন) ছোট শাস্তির স্বাদ তাদেরকে আস্বাদন করাতে থাকবো, হয়তো তারা (নিজেদের বিদ্রোহাত্মক নীতি থেকে) বিরত হবে।[৩৩] আর তার চেয়ে বড় জালেম কে হবে যাকে তার রবের আয়াতের সাহায্যে উপদেশ দেয়া হয় এবং সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়?[৩৪] এ ধরনের অপরাধীদের থেকে তো আমি প্রতিশোধ নেবোই।

থেকে রেওয়ায়াত করেছেন এবং মুসলিম, আহমাদ, ইবনে জারীর ও তিরমিযী সহীহ সনদ সহকারে তা উদ্ধৃত করেছেন।

৩০. এখানে মু'মিন ও ফাসেকের দু'টি বিপরীতমুখী পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। মু'মিন বলতে এমন লোক বুঝানো হয়েছে, যে আল্লাহকে নিজের রব ও একমাত্র উপাস্য মেনে নিয়ে আল্লাহ তাঁর পয়গম্বরদের মাধ্যমে যে আইন–কানুন পাঠিয়েছেন তার আনুগত্য করে। পক্ষান্তরে ফাসেক হচ্ছে এমন এক ব্যক্তি যে ফাসেকী আনুগত্য থেকে বের হয়ে আসা বা অন্যকথায় বিদ্রোহ, বল্গাহীন স্বেচ্ছাচারী মনোবৃত্তি ও আল্লাহ ছাড়া অন্য সত্তার আনুগত্যের নীতি অবলম্বন করে।

৩১. অর্থাৎ দুনিয়ায় তাদের চিন্তাধারা ও জীবন যাপন পদ্ধতি এক হতে পারে না এবং আখেরাতেও তাদের সাথে আল্লাহর আচরণ এক হওয়া সম্ভব নয়।

৩২. অর্থাৎ সেই জান্নাতগুলো নিছক তাদের প্রমোদ উদ্যান হবে না বরং সেখানেই হবে তাদের আবাস। চিরকাল তারা সেখানে বসবাস করবে।

৩৩. "বড় শাস্তি" বলতে আখেরাতের শাস্তিকে বুঝানো হয়েছে। কুফরী ও ফাসেকীর অপরাধে এ শাস্তি দেয়া হবে। এর মোকাবিলায় "ছোট শাস্তি" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

এর অর্থ হচ্ছে এ দুনিয়ায় মানুষ যেসব কষ্ট পায় সেগুলো। যেমন ব্যক্তিগত জীবনে কঠিন রোগ, নিজের প্রিয়তম লোকদের মৃত্যু, ভয়াবহ দুর্ঘটনা, মারাত্মক ক্ষতি, ব্যর্থতা ইত্যাদি। সামাজিক জীবনে ঝড়-তুফান, ভূমিকম্প, বন্যা, মহামারী, দুর্ভিক্ষ, দাংগা, যুদ্ধ এবং আরো বহু আপদ-বিপদ, যা লাখো লাখো কোটি কোটি মানুষকে প্রভাবিত করে। এসব বিপদ অবতীর্ণ হওয়ার প্রয়োজন ও কল্যাণকর দিক বর্ণনা করে বলা হয়েছে, এর ফলে বড় শাস্তি ভোগ করার আগেই যেন মানুষ সচেতন হয়ে যায় এবং এমন চিন্তা ও কর্মপদ্ধতি ত্যাগ করে যার পরিণামে তাদেরকে এ বড় শাস্তি ভোগ করতে হবে। অন্যকথায় এর অর্থ হবে, দুনিয়ায় আল্লাহ মানুষকে একেবারেই পরমানন্দে রাখেননি। নিশ্চিন্তে ও আরামে জীবনের গাড়ি চলতে থাকলে মানুষ এ ভুল ধারণায় লিপ্ত হয়ে পড়বে যে, তার চেয়ে বড় আর কোন শক্তি নেই যে, তার কোন ক্ষতি করতে পারে। বরং আল্লাহ এমন ব্যবস্থা করে রেখেছেন যার ফলে মাঝে মধ্যে বিভিন্ন ব্যক্তি, জাতি ও দেশের ওপর এমন সব বিপদ-আপদ পাঠাতে থাকেন, যা তাদেরকে একদিকে নিজেদের অসহায়তা এবং অন্যদিকে নিজেদের চেয়ে বড় ও উর্ধে একটি মহাপরাক্রমশালী সর্বব্যাপী শাসন ব্যবস্থার অনুভূতি দান করে। এ বিপদ প্রত্যেকটি ব্যক্তি, দল ও জাতিকে একথা স্মরণ করিয়ে দেয় যে, তোমাদের ভাগ্য ওপরে অন্য একজন নিয়ন্ত্রণ করছেন। সবকিছু তোমাদের হাতে দিয়ে দেয়া হয়নি। আসল ক্ষমতা রয়েছে তাঁর হাতে যিনি কর্তৃত্ব সহকারে এসব কিছু করে চলছেন। তাঁর পক্ষ থেকে যখনই কোন বিপদ তোমাদের ওপর আসে, তার বিরুদ্ধে কোন প্রতিরোধ তোমরা গড়ে তুলতে পারো না এবং কোন জিন, রূহ, দেব-দেবী, নবী বা অলীর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেও তার পথ রোধ করতে সক্ষম হও না।

এদিক দিয়ে বিচার করলে এ বিপদ নিছক বিপদ নয় বরং আল্লাহর সতর্ক সংকেত। মানুষকে সত্য জানাবার এবং তার বিভ্রান্তি দূর করার জন্য একে পাঠানো হয়। এর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে যদি মানুষ দুনিয়াতেই নিজের বিশ্বাস ও কর্ম শুধরে নেয় তাহলে আখেরাতে আল্লাহর বড় শাস্তির মুখোমুখি হবার তার কোন প্রয়োজনই দেখা দেবে না।

৩৪. "রবের আয়াত" অর্থাৎ তাঁর নিদর্শনাবলী, এ শব্দগুলো বড়ই ব্যাপক অর্থবোধক। সব ধরনের নিদর্শন এর অন্তরভুক্ত হয়ে যায়। কুরআন মজীদের সমস্ত বর্ণনা দৃষ্টি সমক্ষে রাখলে জানা যায়, এ নিদর্শনাবলী নিম্নোক্ত ছয় প্রকারের ঃ

এক ঃ যে নিদর্শনাবলী পৃথিবী থেকে নিয়ে আকাশ পর্যন্ত প্রত্যেকটি জিনিসের এবং বিশ্ব-জাহানের সামগ্রিক ব্যবস্থার মধ্যে পাওয়া যায়।

দুই ঃ যে নিদর্শনগুলো মানুষের নিজের জন্ম এবং তার গঠনাকৃতি ও অস্তিত্বের মধ্যে পাওয়া যায়।

তিন ঃ যে নিদর্শনাবলী মানুষের স্বতস্ফূর্ত অনুভূতিতে, তার অচেতন ও অবচেতন মনে এবং তার নৈতিক চিন্তাধারায় পাওয়া যায়।

চার ঃ যে নিদর্শনাবলী পাওয়া যায় মানুষের ইতিহাসের ধারাবাহিক অভিজ্ঞতায়।

পাঁচ ঃ যে নিদর্শনাবলী মানুষের প্রতি অবতীর্ণ পার্থিব আপদ-বিপদ ও আসমানী বালা-মুসিবতের মধ্যে পাওয়া যায়।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ فَلَا تَكُنْ فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَآئِهٖ وَجَعَلْنٰهُ
هُدًى لِّبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ﴿٢٣﴾ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا
لَمَّا صَبَرُوْا ۗ وَكَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يُوْقِنُوْنَ ﴿٢٤﴾ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ
يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿٢٥﴾

৩ রুকূ'

এর আগে আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছি, কাজেই সেই জিনিসই পাওয়ার ব্যাপারে তোমাদের কোন সন্দেহ থাকা উচিত নয়।[৩৫] এ কিতাবকে আমি বনী ইসরাঈলের জন্য পথনির্দেশক করেছিলাম।[৩৬] আর যখন তারা সবর করে এবং আমার আয়াতের প্রতি দৃঢ় প্রত্যয় পোষণ করতে থাকে তখন তাদের মধ্যে এমন নেতা সৃষ্টি করে দেই যারা আমার হুকুম অনুসারে পথপ্রদর্শন করতো।[৩৭] নিশ্চিতই তোমার রবই কিয়ামতের দিন সেসব কথার ফায়সালা করে দেবেন যেগুলোর ব্যাপারে তারা (বনী ইসরাঈল) পরস্পর মতবিরোধে লিপ্ত থেকেছে।[৩৮]

ছয় ঃ আর এসবের পরে আল্লাহ তাঁর নবীগণের মাধ্যমে যেসব আয়াত পাঠান ওপরে বর্ণিত নিদর্শনগুলো যেসব সত্যের প্রতি ইংগিত করেছে এ আয়াতগুলোর সাহায্যে যুক্তি–সংগত পদ্ধতিতে মানুষকে সেসব সত্যের জ্ঞান দান করাই কাম্য।

এ সমস্ত নিদর্শন পূর্ণ একাত্মতা সহকারে সোচ্চার কন্ঠে মানুষকে একথা বলে যাচ্ছে যে, তুমি আল্লাহ নও এবং বহু সংখ্যক আল্লাহর বান্দা নও বরং তোমার আল্লাহ মাত্র একজন। তাঁর ইবাদাত ও আনুগত্য ছাড়া তোমার দ্বিতীয় কোন পথ নেই। তোমাকে এ জগতে স্বাধীন, স্বেচ্ছাচারী ও দায়িত্বহীন করে পাঠানো হয়নি। বরং নিজের জীবনের সমস্ত কাজ শেষ করার পর তোমাকে তোমার আল্লাহর সামনে হাজির হয়ে জবাবদিহি করতে এবং নিজের কাজের প্রেক্ষিতে পুরস্কার ও শাস্তি পেতে হবে। কাজেই তোমার আল্লাহ তোমাকে সঠিক পথ দেখাবার জন্য নিজের নবী ও কিতাবসমূহের মাধ্যমে যে পথ–নির্দেশনা পাঠিয়েছেন তা মেনে চলো এবং স্বেচ্ছাচারী নীতি অবলম্বন করা থেকে বিরত থাকো। এখন একথা সুস্পষ্ট, যে মানুষকে এত বিভিন্নভাবে বুঝানো হয়েছে, যাকে উপদেশ দেবার ও পরিচালনা করার জন্য এমন অগণিত নিদর্শনাবলীর সমাবেশ ঘটানো হয়েছে এবং যাকে দেখার জন্য চোখ, শোনার জন্য কান এবং চিন্তা করার জন্য অন্তরের নিয়ামত দান করা হয়েছে, সে যদি সমস্ত নিদর্শনাবলীর দিক থেকে চোখ বন্ধ করে নেয়, যারা বুঝাচ্ছে তাদের কথা ও উপদেশের জন্যও নিজের কানের ছিদ্র বন্ধ করে নেয় এবং নিজের মন–মস্তিষ্ক দিয়েও উল্টা দর্শনই তৈরী করার কাজে আত্মনিয়োগ করে, তাহলে তার চেয়ে বড় জালেম আর কেউ হতে পারে না। এরপর সে দুনিয়ায় নিজের পরীক্ষার

মেয়াদ খতম করার পর যখন তার আল্লাহর সামনে গিয়ে দাঁড়াবে তখন বিদ্রোহের পূর্ণ শাস্তি লাভ করার যোগ্যই হবে।

৩৫. আপাতত দৃষ্টিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করা হয়েছে। কিন্তু আসলে বক্তব্যের লক্ষ হচ্ছে তারা, যারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাত এবং তাঁর প্রতি আল্লাহর কিতাব নাযিল হবার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করছিল। সূরার শুরুতে (২ ও ৩ আয়াতে) যে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হয়েছে এখান থেকে সেদিকেই বক্তব্যের মোড় ফিরে যাচ্ছে। মক্কার কাফেররা বলছিল, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন কিতাব আসেনি, তিনি নিজেই সেটি রচনা করেছেন এবং এখন দাবী করছেন এটি আল্লাহ নাযিল করেছেন। এর একটি জবাব প্রথম দিকের আয়াতে দেয়া হয়েছিল, এখন দ্বিতীয় জবাব দেয়া হচ্ছে। এ প্রসংগে যে প্রথম কথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, হে নবী! এই মূর্খ লোকেরা তোমার প্রতি আল্লাহর কিতাব নাযিল হওয়া অসম্ভব মনে করছে এবং তারা চাচ্ছে প্রতি দু'জনে একজন এটি অস্বীকার না করলেও অন্তত যেন এ ব্যাপারে সন্দেহেই লিপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু এক বান্দার প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে কিতাব নাযিল হওয়াতো মানুষের ইতিহাসে কোন নতুন ঘটনা নয়। এর আগে বহু নবীর প্রতি কিতাব নাযিল হয়েছিল, এগুলোর মধ্যে মূসা (আলাইহিস সালাম)–কে প্রদত্ত কিতাবটি ছিল সবচেয়ে খ্যাতিমান। কাজেই একই ধরনের আর একটি জিনিস আজ তোমাদের দেয়া হয়েছে। তাহলে অযথা এর মধ্যে সন্দেহ করার মতো এমন নতুন কি তোমরা দেখলে?

৩৬. অর্থাৎ সে কিতাবটিকে বনী ইসরাঈলের জন্য পথনির্দেশ লাভের মাধ্যমে পরিণত করা হয়েছিল এবং এ কিতাবটিকে ঠিক তেমনি তোমাদের পথনির্দেশ লাভের জন্য পাঠানো হয়েছে। আগেই তিন আয়াতে একথা বর্ণনা করা হয়েছে। এ উক্তির পূর্ণ তাৎপর্য এর ঐতিহাসিক পটভূমি দৃষ্টিসমক্ষে রাখার পরই অনুধাবন করা যেতে পারে। একথা ইতিহাস থেকে প্রমাণিত এবং মক্কার কাফেরদের কাছেও একথা অজানা ছিল না যে, বনী ইসরাঈল কয়েকশো বছর থেকে মিসরে চরম লাঞ্ছিত ও ঘৃণিত জীবন যাপন করে আসছিল। এ অবস্থায় আল্লাহ তাদের মধ্যে মূসার (আলাইহিস সালাম) জন্ম দেন। তাঁর মাধ্যমে এ জাতিকে দাসত্বমুক্ত করেন। তারপর তাদের প্রতি কিতাব নাযিল করেন এবং তার বদৌলতে সেই অনুন্নত ও নিষ্পেষিত জাতি পথের দিশা লাভ করে দুনিয়ার বুকে একটি খ্যাতিমান জাতিতে পরিণত হয়। এ ইতিহাসের দিকে ইংগিত করে আরববাসীদেরকে বলা হচ্ছে যেভাবে বনী ইসরাঈলকে পথের দিশা দান করার জন্য সেই কিতাব পাঠানো হয়েছিল ঠিক তোমাদেরকে পথের দিশা দান করার জন্য এ কিতাব পাঠানো হয়েছে।

৩৭. অর্থাৎ এ কিতাব বনী ইসরাঈলকে যে শ্রেষ্ঠ জাতিসত্তায় পরিণত করে এবং তাদেরকে উন্নতির যে উচ্চ শিখরে পৌছিয়ে দেয় তা নিছক তাদের মধ্যে কিতাব এসে যাওয়ার ফল ছিল না। এ কিতাব কোন তাবীজ বা মাদুলী ধরনের কিছু ছিল না যে, এ জাতির গলায় ঝুলিয়ে দেবার সাথে সাথেই তারা উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করতে থাকে। বরং আল্লাহর আয়াতের প্রতি তারা যে দৃঢ় প্রত্যয় স্থাপন করে এবং আল্লাহর বিধান

أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي
مَسَاكِنِهِمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ ۖ أَفَلَا يَسْمَعُونَ ﴿٢٦﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا
نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ
وَأَنفُسُهُمْ ۖ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ﴿٢٧﴾ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ
صَادِقِينَ ﴿٢٨﴾ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ
يُنظَرُونَ ﴿٢٩﴾ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرْ إِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ ﴿٣٠﴾

আর এরা কি (এসব ঐতিহাসিক ঘটনা থেকে) কোন পথনির্দেশ পায়নি যে, এদের পূর্বে কত জাতিকে আমি ধ্বংস করেছি, যাদের আবাসভূমিতে আজ এরা চলাফেরা করছে?[৩৯] এর মধ্যে রয়েছে বিরাট নিদর্শনাবলী, এরা কি শুনবে না? আর এরা কি কখনো এ দৃশ্য দেখেনি যে, আমি উষর ভূমির ওপর পানির ধারা প্রবাহিত করি এবং তারপর এমন জমি থেকে ফসল উৎপন্ন করি যেখান থেকে তাদের পশুরাও খাদ্য লাভ করে এবং তারা নিজেরাও খায়? তবুও কি এরা কিছুই দেখে না?[৪০] এরা বলে, "যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তাহলে বলো এ ফায়সালা কবে হবে?"[৪১] এদেরকে বলে দাও, "যারা কুফরী করেছে ফায়সালার দিন ঈমান আনা তাদের জন্য মোটেই লাভজনক হবে না এবং এরপর এদের কোন অবকাশ দেয়া হবে না।"[৪২] বেশ, এদেরকে এদের অবস্থার ওপর ছেড়ে দাও এবং অপেক্ষা করো, এরাও অপেক্ষায় আছে।

মেনে চলার ব্যাপারে যে সবর ও অবিচল নিষ্ঠা প্রদর্শন করে, এ সমস্ত অলৌকিকতা ছিল তারই ফল। স্বয়ং বনী ইসরাঈল জাতির মধ্যে তারাই নেতৃত্ব লাভ করে যারা তাদের মধ্যে আল্লাহর কিতাবের প্রতি প্রকৃত বিশ্বস্ত ছিল এবং যারা বৈষয়িক স্বার্থোদ্ধার ও স্বাদ আস্বাদনে সীমা ছাড়িয়ে যেত না। সত্যপ্রিয়তার খাতিরে তারা যখন দৃঢ়ভাবে প্রত্যেকটি বিপদের মোকাবিলা করে, প্রত্যেকটি ক্ষতি ও কষ্ট বরদাশ্‌ত করে এবং নিজেদের প্রবৃত্তির কামনা থেকে নিয়ে বহিরাগত দীনের শত্রুদের পর্যন্ত প্রত্যেকের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সংগ্রামে লিপ্ত হয় তখনই তারা দুনিয়ায় নেতৃত্বের আসনে বসে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে আরবের কাফেরদেরকে এ মর্মে সতর্ক করা যে, আল্লাহর কিতাবের অবতরণ যেমন বনী ইসরাঈলের ভাগ্যের ফায়সালা করেছিল তেমনিভাবে এ কিতাবের অবতরণও আজ তোমাদের ভাগ্যের ফায়সালা করে দেবে। এখন তারাই নেতৃত্বের আসন অলংকৃত করবে

যারা একে মেনে নিয়ে ধৈর্য ও অবিচলতার সাথে সত্যের অনুসরণ করে চলবে। যারা এর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে তাদের ভাগ্যবিপর্যয় দেখা দিয়েছে।

৩৮. এখানে ইংগিত করা হয়েছে বনী ইসরাঈলের সর্বব্যাপী কোন্দল ও দলাদলির প্রতি। এসব কোন্দলে তারা লিপ্ত হয়েছিল ঈমান ও প্রত্যয়ের সম্পদ থেকে বঞ্চিত হবার, নিজেদের সত্যপন্থী নেতাদের আনুগত্য পরিত্যাগ করার ও বৈষয়িক স্বার্থপূজারী হয়ে যাবার পর। এ অবস্থার একটি ফল তো সুস্পষ্ট। বনী ইসরাঈল কোন্ ধরনের লাঞ্ছনা ও অবমাননার শিকার হয়েছিল, তা সারা দুনিয়া দেখছে। দ্বিতীয় ফলটি এখন দুনিয়াবাসীরা জানে না এবং তা কিয়ামতের দিন প্রকাশিত হবে।

৩৯. যে জাতির মধ্যেই নবী এসেছে তার ভাগ্যের ফায়সালা সেই নবীর ব্যাপারে সে যে নীতি ও দৃষ্টিভংগী অবলম্বন করেছে তার ভিত্তিতেই হয়ে গেছে। রসূলকে প্রত্যাখ্যান করার পর আর কোন জাতি ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচতে পারেনি। তাদের মধ্য থেকে যারা ঈমান এনেছে একমাত্র তারাই টিকে গেছে। প্রত্যাখ্যান কারীরা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি লাভ করে চিরকালের জন্য শিক্ষণীয় বস্তুতে পরিণত হয়ে গেছে। ইতিহাসের এ ধারাবাহিক অভিজ্ঞতা থেকে তারা কি কোন শিক্ষা লাভ করেনি?

৪০. পূর্বাপর আলোচনা সামনে রাখলে পরিষ্কার অনুভূত হয়, এখানে মৃত্যুপরের জীবনের স্বপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করার জন্য এ প্রসংগ উত্থাপন করা হয়নি যেমন কুরআনে বিভিন্ন জায়গায় সাধারণভাবে করা হয়েছে বরং এ প্রসংগে অন্য একটি উদ্দেশ্যে একথা বলা হয়েছে। আসলে এর মধ্যে একটি সূক্ষ্ম ইংগিত রয়েছে এ বিষয়ের প্রতি যে, একটি অনুর্বর পতিত জমি দেখে যেমন কেউ ধারণা করতে পারে না যে, এটিও কোনদিন সবুজ–শ্যামল ক্ষেতে পরিণত হবে। কিন্তু আল্লাহর পাঠানো এক পশলা বৃষ্টিধারাই এর কায়া পাল্টে দেয়। ঠিক তেমনি ইসলামের দাওয়াতও তোমাদের চোখে বর্তমানে একটি অচল জিনিস বলে প্রতিভাত হচ্ছে কিন্তু আল্লাহর কুদরাতের একটি ঝলকানি তাকে এমন উন্নতি ও অগ্রগতি দান করবে যে, তোমরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাবে।

৪১. অর্থাৎ তোমরা যে বলছো, শেষ পর্যন্ত আল্লাহর সাহায্য এসে যাবে এবং আমাদেরকে যারা মিথ্যুক বলছে তাদের ওপর আল্লাহর গযব পড়বে, এ সময়টা কখন আসবে? কবে আমাদের ও তোমাদের ফায়সালা হয়ে যাবে?

৪২. অর্থাৎ এটা এমন কি জিনিস যে জন্য তোমরা অস্থির হয়ে পড়েছো? আল্লাহর আযাব একবার এসে গেলে তখন তো আর তোমরা সংযত হবার সুযোগ পাবে না। আযাব আসার আগে তোমরা যে অবকাশটা পাচ্ছো এটাকে দুর্লভ সুযোগ মনে করো। আযাবকে সরাসরি সামনে দেখার পর ঈমান আনলে কোন লাভ হবে না।